পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত করার চক্রান্ত!

মোতাহার হোসেন

চলতি বছরের ডিসেম্বরের ২ তারিখ পার্বত্যশান্তি চুক্তির ২২ বছর পূর্ণ করে ২৩ বছরে পদার্পণ করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পার্বত্য জেলায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ নিয়ে ঐ সময়ে দেশি বিদেশি মিডিয়ায় এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক চুক্তি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বেশ কিছু প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। কারণ তখন পাশ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিয়ানমারে নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ঐ সময়ে শান্তি ফিরে আসলেও সাম্প্রতিক সময়ে ফের অস্ত্রবাজি ও চাঁদাবাজি অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ঘটছে মাঝে মধ্যে। কিন্তু পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস এবং স্থিতিশীল অবস্থার ওপরই নির্ভর করবে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। শুধু তাই নয়, ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন, এলাকার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও শান্তি নির্ভর করছে তিন পার্বত্য জেলার সর্বিক আইন-শৃঙ্খলা আর স্থিতিশীলতার উপর।

শান্তিচুক্তির পর দীর্ঘদিনের অশান্ত অবরুদ্ধ পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে। একই সাথে তারা মুক্তির স্বাদ পায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন শান্তিবাহিনীর গেরিলারা। সরকারও তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। এর আগে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে বিরাজমান রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষে একদিকে পার্বত্য অঞ্চল হয়ে ওঠে অশান্ত এবং প্রতিনিয়ত ঝরেছে রক্ত, প্রাণ দিতে হয়েছে অসংখ্যক মানুষকে। মূলত: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করা উর্দি পরা সরকারের এক ফরমানে সেখানে সেটেলার হিসেবে পাহাড়ে সমতল অঞ্চলের বাঙালিদের বসতির সুযোগ করে দেয়। মূলত: তখন থেকেই সবুজের অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ে অশান্তি, অস্থিরতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। বাঙালি সেটেলার আর পাহাড়িদের মধ্যে একই সাথে ঘটতে থাকে সংঘাত, সংঘর্ষ, রক্তপাত। শান্তি বিনষ্টের পাশপাশি মানুষে জীবন বিপন্ন হয় আর উন্নয়ন বঞ্চিত হয় সে এলাকার মানুষ। কিন্তু পাহাড়ে শান্তি ও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্যরে লীলাভূমি তিন পার্বত্য অঞ্চলকে ফের অশান্ত করতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কতিপয় স্বার্থান্বেশী মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত দুই বছরে রাঙ্গামাটি, বান্দবান, খাগড়াছড়ির বিভিন্ন উপজেলায় আঞ্চলিক সংগঠনের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে এই তিন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এধরনের সহিংসতা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে ২০ জন মানুষ। একই সাথে শান্তির জনপদ পাহাড়ি অঞ্চলে অস্ত্র, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, গুম, খুনের ষড়যন্ত্র করছে একাধিক স্বার্থান্বেষী মহল। বিশেষ করে “পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির” ব্যানারে ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির’ উপর কাল্পনিক, মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। তাতে সেখানে কর্তব্যরত বিভিন্ন সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে। তাদের এ অভিযোগে মিথ্যা এবং বিদ্বেষপূর্ণ। বরং নিজদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার, শক্তিপ্রদর্শন, চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র খুন, হানাহানি, সংঘাত চলছে। আর এসব ঘটনার দায় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের কর্মকান্ড এই উস্কানিমূলক।

প্রসঙ্গত, পার্বত্য শান্তি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে ‘পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়’ এবং ‘আঞ্চলিক পরিষদ’, ‘তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ’ এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন অদিফতর-সংস্থার মধ্যে রাঙ্গামাটিতে ৩২টি, খাগড়াছড়িতে ৩১টি এবং বান্দরবানে ৩০টি হস্তান্তর করা হয়েছে জেলা পরিষদের কাছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন। পরবর্তীতে সংগঠনগুলোর মধ্যে ফের বিভক্তিও দেখা দেয়। গত বছর ১৫ নভেম্বর ইউপিডিএফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন দল ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক দল গঠন করা হয়। এর আগে ২০০৭ সালে সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিভক্ত হয়। ২০১০ সালের ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা থেকে সুধাসিন্ধু খীসার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি গঠন করা হয়। এ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ছিলেন শক্তিমান চাকমা। শক্তিমান খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আরো স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ি সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো খুন, গুম, অপহরণের মতো ঘটনায় লিপ্ত হয়। স্থানীয় সংগঠনগুলোর মধ্যকার কোন্দল এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় পাবর্ত্যাঞ্চলে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চল নিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে মদদ দেওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নেই। পাবর্ত্যাঞ্চলকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান সরকার শান্তিচুক্তির প্রায় আশি ভাগ বাস্তবায়ন করেছে। বাদবাকী ধারাগুলোও বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার নের্তৃত্বাধীন সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য জেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ওই এলাকায় অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৭২টি ধারা বাস্তবায়ন করার কথা। বিগত ২২ বছরে শান্তিচুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৫৮টি ধারা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে সরকার। চুক্তির অবশিষ্ট ১৪টি

ধারা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা এবং ১৫০০ জনকে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একটি পদাতিক ব্রিগেডসহ ২৩৮টি নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। শান্তিচুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে ৯৯৯টি মামলার মধ্যে ৮৬৬টি মামলা যাচাই-বাছাই এবং এর মধ্যে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চলছে। একই ভাবে সংসদ উপনেতার নেতৃত্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল-২০১০ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দফতরে চাকরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের নির্ধারিত কোটা পূরণ করা হয়েছে। প্রত্যাগত ২২৩টি উপজাতি শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় পদে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের একজন সংসদ সদস্যকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আসছে গত ২০ বছর ধরে। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে জারিকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থসামাজিকভাবেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এর আগে ভূমি বিষয়ক আইন ও বিধিমালা ছিল না। এখন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন ২০০১ প্রণয়ন এবং ২০১৬ সালে আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। শান্তিচুক্তির পূর্বে যেখানে এডিপিভুক্ত প্রকল্প ছিল ১টি, এখন সেখানে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। গত ২১ বছরে গড়ে তিন পার্বত্য জেলায় সরকার,বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯১৫.৮৩ কোটি টাকা। আগে (১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে) যা ছিল ৫০.৫৭ কোটি টাকা। ঢাকার বেইলি রোডে ১.৯৪ একর জমির ওপর ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স'।

শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলোয় স্বাস্থ্য খাতে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলে কোনো মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও কমিউনিটি ক্লিনিক ছিল না। বর্তমানে ট্রাইবাল স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। শান্তিচুক্তির পূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। শান্তিচুক্তির পর ২০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোটার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবছর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন সহস্রাধিক উপজাতি শিক্ষার্থী বিশেষ কোটায় ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। পাবলিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বিশেষ কোটার ব্যবস্থা রয়েছে তাদের জন্য। তিন পার্বত্য জেলায় ৮৭৯.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিন জেলায় এ পর্যন্ত ৭৮০ কিমি. (৩৩ কেভি), ১০০০ কিমি. (১১ কেভি), ১৮৫৫ কিমি. (৪ কেভি) বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪০ হাজার পরিবারের মধ্য থেকে ১৬ হাজার ৫০০ পরিবারকে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে; তাছাড়া তিন পার্বত্য জেলার প্রধান প্রধান সড়কে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় যানবাহন ও পথচাররিরা নিরাপদে চলাচলের সুযোগ পাচ্ছে এবং এসব সড়কে বন্ধ হয়েছে চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতি। সড়ক ও জনপথ বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাস্ত ও সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করছে।

শান্তিচুক্তির পর ২৫৩২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৫১০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ চলছে এবং নতুন করে প্রায় আরো ১০০০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কেওর আওতা বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম এবং চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান-গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রত্যাশা পাহাড়ে শান্তি ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখথতে সব রকমরে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সরকারের দায়িত্বশীল মহল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

#

০১.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার

লেখক : সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম।